পঞ্চম অধ্যায়
অণুনাটকে অনন্যতা

''ধরুন একটা সরল রেখা আঁকতে গিয়ে বেঁকে গেল
বাঁকাই থাক না— গোটাকতক সবুজ পাতা এদিকে সেদিকে জুড়ে দিলেই
গাছের শাখা। এবার একটা পাখি চাইতো?
গোপন একটা খাঁচা এনে ঝুলিয়ে দিন ঐ আঁকা ডালে
আপাতত দরজা চাইনা।''[১]

মোহিত চট্টোপাধ্যায় অণুনাটক নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন ২০০৩ সাল থেকে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় বারবার অণুনাটক সম্পর্কিত নানা ভাবনার কথা বলতেন। ২০০৪ সালে নাট্যব্যক্তিত্ব সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্তকে তিনি 'কালোব্যাগ' নামে একটি অণুনাটক লেখার কথা জানিয়েছিলেন। এটিই ছিল তাঁর প্রথম অণুনাটক লেখা। নাটকটি পড়তে সময় লেগেছিল দশ থেকে এগারো মিনিট। নাটকটি পনেরো থেকে আঠারো মিনিটেই প্রযোজনা করা সম্ভব।

তারপর তিনি বেশ কিছুদিন স্বল্প দৈর্ঘ্যের এবং পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনার তাগিদে অণুনাটক লিখে উঠতে পারেননি। কিন্তু অণুনাটক নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি এবং বিশ্বের অণুনাটক নিয়ে পড়াশোনার কথাও বলেছিলেন। আরও অণুনাটক লেখার ভাবনা এই সময়ই শুরু করেছিলেন। দৃঢ় মতবাদ গড়ে নিয়েছিলেন অণুনাটক বিষয়ে।

অণুনাটক নিয়ে তাঁর ভাবনা বিষয়ে দুটি মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হয়েছে অনেক পরে। 'প্রস্তাবনাসহ দুটি অণুনাটক' প্রকাশ পেয়েছে গণনাট্য সংঘের 'গণনাট্য' পত্রিকায়। 'অণুনাটকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমার নিজস্ব ধারণা কী তা সূত্রাকারে জানাচ্ছি' এই নামে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে অণুনাটক বিকাশ মঞ্চের মুখপত্র 'অণুনাটক সমাচার' পত্রিকায়। দুটি লেখাই পরবর্তীকালে সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্তের সম্পাদনায় 'নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন' থেকে 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় অণুনাটক সংগ্রহ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে। 'অণুনাটক প্রস্তাবনা' প্রবন্ধে মোহিত চট্টোপাধ্যায় অণুনাটক সম্পর্কে নিজস্ব প্রস্তাবনায় বলেছিলেন—

''ইউরোপ আমেরিকায় দশ মিনিটের অণুনাটক বা মাইক্রো প্লে-র জয় জয়কার চলছে। এই ধারার নাটকের তুমুল জনপ্রিয়তার ঐতিহাসিক উৎস একটি নাট্যোৎসব 'The Human Festivals of New American plays' ১৯৮০ সালে Actor Theatre of Luisville এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। তার তিন বছরের মধ্যে এই অণুনাটক প্লাবন নিয়ে এল। নাটকের ইতিহাসে সূচিত হল এক নতুন অধ্যায়।''[২]

সেই যে ১৯৮০ সালে অণুনাটকের যাত্রা শুরু হয়েছিল তারপর বহুমুখী গতিতে অণুনাটক দেশ বিদেশের মঞ্চে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে, পথে ঘাটে, ঘরোয়া অনুষ্ঠানে সর্বত্র জায়গা

করে নিল। বিদ্যালয়ের সিলেবাসেও অণুনাটক জায়গা করে নিয়েছিল, ওয়ার্কশপও হল অণুনাটক নিয়ে। চার-পাঁচটি অণুনাটক নিয়ে নাট্যানুষ্ঠান হতে লাগল। দীর্ঘকালীন অনুষ্ঠানের বিরতি হিসেবেও অণুনাটক মঞ্চস্থ হল। বিষয় ও প্রযোজনাতে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার সাক্ষী হল মানুষ। তিনি বলেছেন—

> ''এই সমস্ত গুনাবলি ও উপযোগিতার কারণে অণুনাটক রচনায় বহু নতুন নাটককারের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। একই সঙ্গে মোমেট, ক্রিস্টোফার ডুরাঙ, ক্রেইগ লুকাস, অ্যাঙ্গাস উইলসন প্রমুখ সুবিখ্যাত নাটককারও এই অণুনাটক রচনায় ব্রতী হলেন।''[৩]

বিদেশে দশ, পাঁচ, দুই বা এক মিনিটের অণুনাটক হলেও আমাদের দেশে দশ থেকে কুড়ি মিনিট অণুনাটকের সময়সীমা রাখার কথা তিনি বলেছেন। যেহেতু ভারতীয়রা দীর্ঘ সময়ের নাটক দেখে অভ্যস্ত তাই হঠাৎ করে খুব কম সময়ের নাটক করলে দর্শকরা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে।

কম সময়ের এই নাটককে তিনি অণুনাটক বলতে চান এই কারণে, যেহেতু এক ঘন্টা বা দু ঘন্টার নাটক যা বলতে চায়, অণুনাটক তা দশ বা কুড়ি মিনিটে বলতে পারে। ছোট্ট মুঠোর মধ্যে সমস্ত আকাশটাকে ধরা যায়। তিনি বলেছেন—

> ''এটা শক্ত কাজ। এ কারণেই অণুনাটক একটা Challenging dramatic format। একটা আদর্শ অণুনাটকের মধ্যে একটা miniature world স্থাপন করা যায়। এক্ষেত্রে এ নাটক Atomic expression of a big thing। এই আণবিক গুরুত্বের দিকটা মনে রেখেই এ ধরনের নাটকের অণুনাটক নামটি সঙ্গত হয়ে উঠতে পারে।''[৪]

অণুনাটকের বৈশিষ্ট্য :

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ সক্রিয়তা ও প্রেরণায় নাট্যকার রতনকুমার ঘোষ মহাশয়ের আহ্বানে ২৯ শে মার্চ ২০০৮ শনিবার ব্যারাকপুর সুকান্ত সদনে অণুনাটক বিষয়ক একটি সম্মেলনে বিভিন্ন নাট্যকর্মী ও নাট্যসংগঠক উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার শেষে অণুনাটকের প্রসার ও বিকাশের জন্য 'অণুনাটক বিকাশ মঞ্চ' গঠিত হয়। এই নবগঠিত সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অণুনাটকের উন্নতি, প্রসার ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণ, দলগত সম্পর্ক স্থাপন, পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদর্শন ও সকলের স্বার্থবাহী কর্মসূচি প্রণয়ন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উৎসাহী নাট্যদলকে এই কাজে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। নাট্যব্যক্তিত্ব প্রসাদকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের মতে অণুনাটকের সংজ্ঞা হল—

> ''বিজ্ঞানের ভাষায় স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট মৌল বা যৌগের ক্ষুদ্রতর কণা যার মধ্যে ঐ পদার্থের সমস্ত ধর্ম নিহিত থাকে তাকেই অণু বলে। ঠিক তেমনি নাটকের সমস্ত উপাদান ও বৈশিষ্ট্যকে গর্ভে ধারণ করে। সামান্য পরিসরে, স্বল্প-সংলাপে নাট্যদ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যে দিয়ে নাট্যরসকে দর্শক মননে সিঞ্চিত করা হয় যে নাটকে, যা দর্শককে তৃষিত করে, তৃষিত দর্শককে পুকুর থেকে সরোবর, সরোবর থেকে নদীতে ধাবিত করার আশা জাগায় তাই অণুনাটক।''[৫]

অণুনাটক বিকাশ মঞ্চের কাজের সূচনা হয় ২২শে জুলাই ২০০৮ মঙ্গলবার কলকাতায় জীবনানন্দ সভাঘরে আয়োজিত এক সেমিনারের মাধ্যমে। এই সেমিনারে মূল বক্তা ছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর রচিত অণুনাটক প্রকাশিত হয়েছে। এবং অনেক সাক্ষাৎকার ও লেখায় তিনি অণুনাটক চর্চার স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মতে অণুনাটকের বৈশিষ্ট্য গুলি হল—

> ''একটি আদর্শ অণুনাটকের মধ্যে একটি miniature world স্থাপন করা যায়। এক্ষেত্রে এ নাটক Automatic expression of Leigtatal thing''[৬]

এই আণবিক গুরুত্বকে মনে রেখেই এ ধরনের নাটককে বাংলায় 'অণুনাটক' নামে অভিহিত করা হয়েছে। বাংলা অণুনাটক দশ থেকে পনেরো মিনিট হওয়ার পক্ষে তিনি মত দিয়েছেন। এই নাটক অণু হলেও এর মধ্যে নাটকের সব গুণই রাখতে হবে। দ্রুততায় শেষ করতে গিয়ে যেন নাটকের ধর্ম হারিয়ে না যায়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

দ্বিতীয়ত: সব নাটকেই ক্রাইসিস থাকে। অণুনাটক যেহেতু খুব ছোট তাই এক্সপোজিশন এবং অন্যান্য বিষয়ে সময় নষ্ট না করে প্রথমেই ক্রাইসিস-এ চলে যাওয়া যেতে পারে। প্রত্যেক নাটকেই চরিত্ররা একটা কিছু করতে চায়। একে তিনি বলেছেন 'লক্ষবিন্দু'।

> ''সেখানে যখন বাঁধা আসে তখনই দেখা দেয় Crisis বা সংকট। তার থেকে দেখা দেয় Tension, conflict— এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই নাটকের Action চূড়ান্ত পরিণতি বা Climatic ending-এ পৌঁছায়।''[৭]

এভাবেই অণুনাটককে সম্পূর্ণ পরিণতির দিকে যাওয়ার জন্য ক্রাইসিস থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হবে। নাটকের শেষে সমাধান রাখা যেতে পারে নাও পারে। উপসংহার স্পষ্ট রাখলে দর্শক বা পাঠক নিজে থেকেই বুঝতে পারবেন।

তৃতীয়ত: শক্তিশালী প্রতিভাবান লেখক ছাড়া অণুনাটক রচনা করা সম্ভব নয়। কেননা অণুনাটকে বিন্দুতে সিন্দুর স্বাদ সৃষ্টি করতে হবে, মুঠোর মধ্যে আকাশটাকে ধরতে হবে।

> ''চাই গভীর Substance and unique style। নাটকের meaningful journy-র জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাই অণুনাটকের শ্রেষ্ঠত্ব রচনা করতে পারে । ... অণুনাটক is not easy to write, easy to manage only''[৮]

অণুনাটক পড়া বা দেখার পর যাতে দীর্ঘক্ষণ পাঠক বা দর্শকের মনে আচ্ছন্নতা বা রেশ থেকে যায়— সেভাবেই অণুনাটকের বিষয় এবং উপস্থাপনভঙ্গি হবে।

চতুর্থত: অণুনাটক ক্ষুদ্র বলে হালকা বিষয় নিয়ে লিখে দর্শককে হাসানোই এর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। দর্শক বা পাঠককে শুধু হাসালেই হবে না, তাদের মনে চেতনার দাগ যেন ফেলতে পারে, আলোড়নের জন্ম দিতে পারে, হাসির মাধ্যমেই সিরিয়াস সমাজ-রাজনৈতিক-মানবিক বিষয়ে সচেতন করানো যায় তা লক্ষ রাখতে হবে।

পঞ্চমত : অণুনাটকের শরীরে কোথাও বাড়তি মেদ থাকবে না, চেহারার দিক দিয়ে একেবারে ছিম-ছাম হবে। সংলাপ চরিত্র বিষয়ে এতটাই বাহুল্যহীন হবে যে অণুনাটকে আপনা থেকেই দ্রুত গতির সঞ্চার হবে। "sub-plot থাকবে না, focus on one action"[৯] অণুনাটকে গতিশীলতার উপরেই নির্ভর করছে দর্শকদের উপভোগ্যতা গ্রহণের মাত্রা।

অণুনাটক কীভাবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে একটা বৃহত্তর নাট্য আন্দোলনের জন্ম দিতে পারে, সে বিষয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ছিল সজাগ দৃষ্টি। এই কারণে অণুনাটকের নানা উপযোগিতার কয়েকটি দিক হল, যেহেতু অণুনাটক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর মতো তাই অণুনাটক অল্প সময়েই মঞ্চস্থ করা যায়। তাই ''একটি অনুষ্ঠানে ছটি অণুনাটক পরিবেশিত হতে পারে। এর ফলে নানা ধরনের নাটক তাদের বিভিন্ন Theme, form এবং বিচিত্র স্বাদ দর্শকদের উপহার দেয়। এই বৈচিত্র্যের সম্ভার অণুনাটকের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।''[১০]

দ্বিতীয়ত: শুধুমাত্র দর্শকই নয়, একটি নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য নাটককার, পরিচালক, অভিনেতা সকলের মধ্যেই অণুনাটক একটা নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই ধরনের নাটকে নাট্যকার যেমন নতুন নতুন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তেমনি নির্দেশকও নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে, অভিনেতাও বিভিন্ন রকমের চরিত্রে অভিনয় করে। অবশেষে সমবেত প্রচেষ্টা দর্শকদের মনে একটা অন্যরকম আনন্দ নিয়ে আসে।

তৃতীয়ত: অণুনাটক লিখতে পারা মানে একজন অভিজ্ঞ নাট্যকার হয়ে ওঠা। কেননা অণুনাটক এক দিনে আসে না। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ, দক্ষ নাট্যকাররাই অণুনাটক লিখতে সক্ষম হয়। ফলে অণুনাটক উৎকৃষ্ট নাটক লিখতে শেখায়।

> ''সংক্ষিপ্ত পরিসরে সব রকমের বাহুল্য বর্জন, বিষয়কে ঘনীভূত করে তোলা, লক্ষ্য বা focus-কে steady রাখা, tight action-এর মধ্য দিয়ে perfect মুহূর্ত রচনা ইত্যাদি নাটকের সৃষ্টিকাণ্ডের অনেক দিক এ ধরনের নাটক লেখার মধ্য দিয়ে উন্নত হয়।''[১১]

চতুর্থত: অণুনাটকের চরিত্র ঘটনা সীমিত বলে তার সর্বত্র মঞ্চস্থ হওয়ার সুযোগ রয়েছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, নাট্যমঞ্চ, অফিস, খেলার মাঠ, পাহাড়, ক্লাব, মেলা প্রাঙ্গন, ঘরোয়া অনুষ্ঠান, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক যে কোন অনুষ্ঠানে এছাড়া কোনও বড় নাটকের আগে, দীর্ঘকালীন অনুষ্ঠানের বিরতিতে curtain raiser হিসেবে অণুনাটক মঞ্চস্থ করা যেতে পারে।

পঞ্চমত: অণুনাটক রচনা, প্রযোজনা, অভিনয়, মঞ্চসজ্জা নিয়ে ওয়ার্কশপ করা যেতে পারে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য অণুনাটকগুলি হল— 'কালোব্যাগ' (২০০৪), 'একটি মাথা দুটি ছাতা' (২০০৯), 'মৌমাছি' (২০০৭), 'ইন্টারভিউ' (২০০৯), 'কাঁথা' (২০০৯), 'মুখ' (২০০৯), যোলোপাতা (২০০৯)।

কালোব্যাগ: 'কালোব্যাগ' অণুনাটকটি 'থিয়েটার রঙ্গ নাট্যপত্রে' ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া রঙ্গপট৪, ২০০৭ এবং অণুনাটক সমাচার ১.১.২০০৯-এ পুনঃপ্রকাশিত হয়। নাটকে মোট পাঁচটি

চরিত্র রয়েছে— সত্যচরণ, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দারোগা। নাটকটির প্রথমেই মুখ্য চরিত্র সত্যচরণের একটি কালো রঙের ব্যাগ দিল্লি থেকে অডিট-এর কাজ সেরে ফেরার পথে হারিয়ে যায়। ওই ব্যাগে সত্যচরণের অডিট সংক্রান্ত অফিসিয়াল পেপারস ছাড়াও ক্যাশ দু'হাজার টাকা ছিল, অফিস এই জরুরী কাগজগুলো দিয়ে তাকে পাঠিয়েছিল। দিল্লিতে পনেরো দিন ধরে অডিট এর কাজ করেছে সে। তাই তিনি থানায় সহযোগিতা পাওয়ার আশায় আসেন এবং দারোগাবাবুকে বিস্তারিত জানান। দারোগাবাবু ও সত্যচরণ দুজনের নামই এক হওয়ায় এবং পূর্ববঙ্গে একই জেলায় তাদের বাড়ি হওয়ায় দারোগাবাবু দেশের মানুষ পেয়ে খুশি হন। তারপর সত্যচরণকে আশ্বাস দেন যে বিকেলের মধ্যে সে তার ব্যাগ ফিরে পাবে।

বিকেলে দারোগাবাবুর কাছে এসে সত্যচরণ হতাশ হয়। কেননা যে গাড়িতে তার ব্যাগটি হারিয়েছিল, সেই নম্বরের মালিক থাকে পঁচিশ নম্বর ওয়ার্ডে। তাই কেশটা এখন ডিল করবে পঁচিশ নম্বর ওয়ার্ডের ওসি। কাজেই এ ব্যাপারে এই দারোগাবাবু আর কোন সহযোগিতা করতে পারবেন না।

এবার ২৫ নং ওয়ার্ডের থানায় আসে সত্যচরণ। মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে নাট্যকারের নির্দেশ হল প্রথম দৃশ্যের প্রায় থানার মঞ্চরূপের বদল হবে না। যেহেতু সব থানার চেহারা চরিত্র প্রায় একই রকম। যাইহোক দ্বিতীয় দারোগা জানান সত্যচরণের দেওয়া ৪৫৫৪ নম্বরের গাড়িটি ট্রেস করে তারা জানতে পেরেছেন গাড়িটি দশদিন ধরে গ্যারেজে পড়ে আছে। কাজেই একদিন আগে ঐ গাড়িটি সত্যচরণকে নিয়ে আসতে পারে না। দারোগাবাবু বলেন, নিশ্চয়ই সত্যচরণের দেওয়া গাড়ির নম্বরটি ভুল হয়েছে। নম্বরটি ৪৫৫৪ না হয়ে ৪৫৪৫ হবে। আর এই নম্বরের গাড়িটি দু'নম্বরের ওয়ার্ডে আছে।

সত্যচরণ আবার দু'নম্বর ওয়ার্ডে ৩য় দারোগাবাবুর কাছে আসে। কিন্তু সেখানেও দারোগাবাবু জানান যে, তাকে ৫নং ওয়ার্ডে যেতে হবে। কেননা ৪৫৪৫ নম্বরের গাড়ির ড্রাইভারটি অ্যাক্সিডেন্ট করে ৫নং ওয়ার্ডের ফাটকে আছে। সত্যচরণ এবারও বাধ্য হয়ে ৪র্থ দারোগাবাবুর কাছে আসে। দারোগাবাবু সব দেখেশুনে জানান, সে যে ট্যাক্সিতে এসেছে তার ড্রাইভার তাদের গারদের লোকটি নয়। তাছাড়া তার ড্রাইভারটির বয়সও এর চেয়ে বেশি। এবার সত্যচরণের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়। সে পরিষ্কার দারোগাবাবুকে জানিয়ে দেয়— তার যা গেছে তা যাক, সে আর থানায় থানায় দৌড়তে পারবে না। সে ধরে নেয় যে তার আর কিছু হারায়নি।

তাই এ নিয়ে সে আর 'Pursue' করতে চায় না। তার কেসটা ক্লোজ করে দিতে দারোগাবাবুকে সে অনুরোধ করে। দারোগাবাবু বলেন, লিখিত দিতে হবে সে আসলে কিছু হারায়নি। সত্যচরণ তাই লিখে দেয়। কিন্তু এরপরেই তাকে গারদে ঢুকতে হবে বলে দারোগাবাবু জানান। থানায় থানায় যেভাবে পুলিশেরা তাকে দৌড় করাচ্ছিল, অতিষ্ঠ হয়ে সে রেহাই পেতে চেয়েছিল। কিন্তু যে কারণেই হোক, কিছু না হারানো সত্ত্বেও বিভিন্ন থানাকে harass করানোর জন্য সত্যচরণকে গারদে ঢুকতে হবে বলে দারোগাবাবু হুকুম করেন। কেননা আইনের কাছে নাকি তাদের হাত বাঁধা।

''৪র্থ দারোগা।। পুলিশ আপনার case-টার একটা solution তো করে দেখালো যে

আমাদের অপদার্থতার অভিযোগটা কত অমূলক। Justice! Justice এখানে পাবেন। সত্যচরণ এটা কি একটা Justice হল?'[১২]

নাটকের শেষে দারোগাবাবুর নির্দেশে হরি সত্যচরণকে গারদে নিয়ে যায়।

রাষ্ট্রের পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের নাগরিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান। নাগরিকদের জীবন-জীবিকা যাতে বাঁধাপ্রাপ্ত না হয়, তার বন্দোবস্তে পুলিশ-প্রশাসন চব্বিশ ঘন্টা নিয়োজিত। কিন্তু এই পুলিশ-প্রশাসনই যখন নাগরিকদের নিরাপত্তা হননের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সমস্যা জর্জরিত সাধারণ মানুষের জীবনকে আরও সমস্যার মধ্যে ঠেলে দেয়। তখন সেটা সাধারণ অন্যায় নয়, রাষ্ট্রকৃত অন্যায় হয়ে দাঁড়ায়। যেটা এককথায় ভয়াবহ। আসলে নাট্যকার ছোট্ট একটি নাটকের মধ্যে সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নাড়িয়ে দেন, প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন।

একটি মাথা দুটি ছাতা: একটি মাথা দুটি ছাতা অণুনাটকটি নান্দীকার ২২তম জাতীয় নাট্যমেলা বুলেটিনে প্রথমে প্রকাশ হয়, পরে রঙ্গপট ৪, ২০০৭-এ পুনমুর্দ্রিত।

বিকেল বেলায় পার্কের বেঞ্চিতে দু'জন প্রধান ব্যক্তি বসে আছেন। প্রথমজন বেঞ্চিতে বসে আছেন। দ্বিতীয়জন বেঞ্চিতে বসে পায়ের জুতো পালিশ করাচ্ছেন একটি খালি গায়ের বাচ্চাকে দিয়ে। দু'জন প্রবীণের কোলে ছাতা। একজন সৌম্য দর্শন প্রৌঢ় জগিং করতে করতে বেঞ্চির একধারে বসেন। একসময় তার বেজায় নামডাক ছিল। কিন্তু তা ছেড়ে দিয়ে তিনি হঠাৎ স্থির করেন পথে ঘাটে ঘুরে ঘুরে কেউ কোন বিচার চাইলে তার রায় দেবেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অন্যান্য নাটকের মতো এখানেও এই অদ্ভুত ধরনের চরিত্রটি বিদ্যমান।

প্রথমজন বেঞ্চির পিছনে ঝোলানো একটি ছাতা তুলে নিয়ে যাবার জন্য উদ্যোগ করেন। দ্বিতীয়জন ছাতাটা বেমালুম হস্তগত করার জন্য উনাকে দোষারোপ করেন। প্রথমজন জানান, একটা বেওয়ারিশ ছাতা এইভাবে পড়ে থাকলে কেউ না কেউ তুলে নিতই। তাই তিনিই ইচ্ছা করে ছাতাটি তুলে নিয়েছেন। এটা কোন দোষের বলে তার কাছে মনে হয়নি। তাছাড়া তিনি এখানে অনেকক্ষণ বসেছিলেন, দ্বিতীয়জন তারও আগে এসেছেন। যার ছাতা সে এতক্ষণ যখন আসেননি, ভবিষ্যতেও তার আশার সম্ভাবনা নেই বলে তিনি জানান। কিন্তু বাচ্চা ছেলেটি জানায়, তাদেরও আগে এই বেঞ্চিতে একজন বসেছিলেন। সে তার জুতো পালিশ করেছে। তার সঙ্গে একটি ছাতা ছিল। সে দেখেছে উনি এখানেই ছাতাটা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। বলেছিলেন তার ট্রেন ধরার তাড়া আছে। জুতো পালিশ হয়ে যাওয়ার পর তিনি এখান থেকে চলে যান। মনে হয় সেই ভদ্র লোকটি হয়তো মনের ভুলে ছাতাটি রেখে গেছেন। একথা শোনার পরেও দ্বিতীয়জন জানান প্রথমজন অন্যের ছাতাটি নিতে পারলে তিনিও তা দাবি করেন। কেননা ছাতার মালিক চলে যাওয়ায় তারা দুজনেই এখানে ছিলেন।

কিন্তু কেউ কাউকে ছাতাটা দিতে রাজি নন। ছাতাটির দাবি নিয়ে দু'জনের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়। হঠাৎ পাশ থেকে জজসাহেব এসে ম্যাজিকের মতো তাদের সমস্যার সমাধান করে দেন। তিনি বলেন—

''জজ সাহেব।। ... আচ্ছা, রোদ-বৃষ্টিতে আপনারা দুটো ছাতা মাথায় নিয়ে চলতে পারেন? একটি মাথার জন্য একটি ছাতাই তো চাই।''[১৩]

প্রথম ও দ্বিতীয়জন জজসাহেবের কথায় বুঝতে পারেন যে, তাদের দু'জনেরই প্রয়োজন মেটাতে একটি করে ছাতা আছে।

আসলে দুনিয়ায় যে এত অশান্তি তার মূলেও এই বাড়তি সম্পদের দিকে ঝোঁক। প্রথম ও দ্বিতীয়জন নিজেদের চাহিদা মিটলেও তাতে সন্তুষ্ট না থেকে বাড়তি সম্পদের দিকে হাত বাড়াচ্ছিলেন। তাই এই ছাতাটি জজসাহেব বাচ্চাটিকে দিয়ে বলেন— ''যার একটিও নেই, তারই প্রাপ্য এই ছাতাটি।''[১৪]

এই নাটকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের মানসিক দৈন্য এবং অতিরিক্ত লোভের মানসিকতাকে আঘাত হেনেছেন নাট্যকার। আসলে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃত সমাজে অতিরিক্ত লোভের মানসিকতারই প্রকাশ ঘটেছে প্রধান দুটি চরিত্রের মধ্যে। শুধুমাত্র শিল্পপতি বা কোটিপতি ব্যবসায়ী শ্রেণির মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত লোভ, মুনাফার মানসিকতা নেই, মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষও অতিরিক্ত চাহিদা, সঞ্চয় ও লোভের মানসিকতায় আচ্ছন্ন। এর থেকে মুক্তি সম্ভব একমাত্র সমষ্টির মালিকানাধীন সমাজব্যবস্থায়। জজসাহেব ছাতাটা জুতো পালিশ করা ছেলেটিকে দিয়ে আসলে সমষ্টির কল্যাণের মানসিকতারই প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তির প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পত্তির সঞ্চয় নয়, সমষ্টির মধ্যে তার বিতরণেই মুক্তি।

মৌমাছি : 'মৌমাছি' অণুনাটকটি ২০০৯-এর 'রঙ্গপট' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। নাটকটিতে বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে অবক্ষয়ী সমাজে নারীর প্রেম, বিবাহ ও বিচ্ছেদের সমস্যা অভিনব ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। সুখের খোঁজে এক মহিলার আত্মকথন নাটকটির মূল বিষয়। চার-চারবার সে বিয়ে করে। কিন্তু প্রতিবার কোন না কোন অজুহাতে সে ডিভোর্স দেয়।

নাটকটির শুরু ছবি নামে গ্ল্যামারাস তরুণীর ফোনে কথা বলাকে কেন্দ্র করে। ছবি ফোনে বলতে থাকে,

''ছবি ।। .... শোন, নরেনকে নিয়ে একটা ইনিংস খেলেছিস, ঠিক আছে এবার নেক্সট ইনিংস আর কোনও পার্টনারকে নিয়ে খেল। দু'বছরের বেশি ম্যারেড লাইফে চার্ম থাকে? বিয়ে হচ্ছে সেই খাঁচা, যেখানে সবাই ঢুকতে চায়, আর যারা ঢুকে পড়েছে তারা বেরুতে চাইছে। সারা জীবন সুখে থাকতে পারে এমন কোনও স্বামী-স্ত্রী হয়? হতে গেলে স্বামীটি হবে অন্ধ, আর বউটি বোবা। একজন প্রেমিক ক্ষয়ে ক্ষয়ে হাড়গিলে হলে যা হয়, তার নাম হাজব্যান্ড।''[১৫]

নাটকটির উপস্থাপন ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য রয়েছে। ছবির ঘরের এক জায়গায় একটা ছোট পার্টিশনে জানলার মতো পাশাপাশি দুটি ফ্রেম আছে। প্রতিবার ফ্রেমে ছবির চারজন ডিভোর্সী স্বামী এক এক করে আসে। আর ছবি তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদের কারণ জানাতে থাকে। সবার প্রথমে ফ্রেমে নন্তুর আবক্ষমূর্তি দেখা যায়। ছবি নন্তুকে বলে, সে নন্তুকে ভুলেনি। কোনও মেয়ে তার জীবনের প্রথম পুরুষকে ভোলে না। নন্তু একটু গাবলু হলেও দেখতে ভালোই ছিল। কিন্তু তাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি ছবির কাছে আস্তাকুঁড়ে

মনে হত। তখন তার মনে হত 'ম্যারেজ হচ্ছে মিউচুয়াল সুইসাইড প্যাক্ট।'[১৬] আর তার পরে নন্তু নিজেই খালকেটে কুমির এনে নিজের সর্বনাশ করেছিল। নন্তু নিজে ছিল লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। খুব কম বেতন। তাই তার বড় লোক বন্ধু বান্টিকে এনে ছবিকে খুব করে আপ্যায়ন করতে বলত। নন্তুও সবসময় বান্টির কাছে ধারদেনা করত। এইভাবে ছবির একদিন বান্টিকে ভালো লেগে যায়—

> ''ছবি।। ... বান্টি মার্সিডিস গাড়ি হাকিয়ে আসত, চোখে লাগার মতো সাজ ... সারা ঘর মিষ্টি পারফিউমের গন্ধে ভরে যেত। ঘরে ঢুকেই বান্টি আমাকে রোজ একটা তাজা রক্তগোলাপ উপহার দিত। বান্টির পয়সা ছিল, খরচ করতেও জানত। আজ সিনেমা, কাল শপিং মল, ... পিকনিক, ফাংশন— রোজ একটা না একটা প্রোগ্রাম নিয়ে আসত বান্টি, আর সব খরচা ওর। শহরের কোন বড় রেস্তোরায় বান্টি আমাদের খাওয়ায়নি বলো তো?''[১৭]

ফ্রেম থেকে চোখ মুছতে মুছতে নন্তু সরে যায়। তারপর বান্টিকে তির্যক রুক্ষ চাহনিতে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়। বান্টিকে ছাড়ার কারণ হল— সে নন্তুর মতো সরল একজন মানুষকে ঠকিয়েছে। ছবি তখন সতেরো আঠারো বছরের অবুঝ একটা মেয়ে। তাই সে মনে করে নন্তুকে ছাড়ায় তার কোন দোষ ছিল না, সব দোষ ছিল বান্টির। আর তাছাড়া নন্দদুলালকে ছবির প্রাইভেট টিউটর রাখাটা নাকি বান্টির সবচেয়ে বড় ভুল ছিল। ছবি নন্দদুলাল সম্পর্কে বলে—

> ''ছবি ।। ... অধ্যাপক, কবি, গল্পকার, নাটককার কী নয় নন্দদুলালদা! ... আমার রূপ, আমার শরীরটা যে কী তা কোনও দিন ভেবেছ, বান্টি? ... তোমার পয়সা আছে, কিন্তু চোখ নেই, বলার ভাষা নেই। তোমার সঙ্গে নন্দদুলালদার পার্থক্যটাই তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদের কারণ হয়ে উঠল। নন্দুদা বলতেন 'চারাগাছে কতটা জল চাই, এটা বুঝতে হবে।' কী সুন্দরভাবে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, 'ছবিলি, তুমি একটি চারাগাছ, যে পল্লবিত হয়ে উঠতে চাইছে। নন্তু তোমার শিকড়ে জলই দেয়নি, তাই তুমি শুকিয়ে যাচ্ছিলে, আর বান্টি বেশি জল ঢেলে তোমার শিকড়টাই পচিয়ে দিচ্ছে। কেবল আমিই বুঝি, তোমার শিকড় কতটা তৃষ্ণার্ত, তার কতটুকু পানীয় দরকার।''[১৮]

এরপরেও ছবির বান্টির কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

বান্টি ফ্রেম থেকে সরে যায়। অন্য ফ্রেমে নন্দদুলালের গর্বিত মুখ— স্মিত হাসি। ছবি এতক্ষণ তার গুণগান করছিল বলে নন্দদুলাল বেশ তৃপ্তি পাচ্ছিলেন। কিন্তু নন্দকেও ছবির নন্তুর মতো হাড়বজ্জাত কিপটে মনে হয়েছিল। একটা লিপস্টিক কিনে দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই, প্রেম নেই অথচ প্রেমপত্র লেখার কৌশলটি তিনি ভালোই রপ্ত করেছিলেন। তাছাড়া নন্দর বিখ্যাত লেখক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ছবির অভিযোগ—

> ''ছবি।। পনেরো বছর ছাইভস্ম লিখে, একটি চটি বই এক বন্ধুর ঘাড় ভেঙে ছাপলে। কেউ সে বইয়ের খবরও রাখে না।''[১৯]

নন্দদুলাল ফ্রেম থেকে সরে যান। ফ্রেমে বেশ মোটা চেহারার সরলকান্তি আসেন। ছবির

তিন-তিনখানা ডিভোর্সের উকিল ছিল সরলকান্তি বটব্যাল। হঠাৎ একদিন তিনি বলেন—

> ''ছবি, এতদিন তোমার বিয়ে ভাঙার পান্ডা ছিলাম, এবার আমায় বিয়ে করলে একাজটি বন্ধ হবে।''[২০]

ছবি বলেছিল—

> ''ছবি।। সরল বিয়ে আমার কাছে ক্যারিয়ার ... হ্যা, তুমি তোমার জমানো টাকার বারো আনা তৎক্ষণাৎ আমার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে জমা করে দিয়েছিলে। বিয়েটা হল। কিন্তু বিয়ের একটা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই, তোমার শরীরের ওজন ৬৯ থেকে ৮৫ কেজি হল। সুতরাং Gaining 80kg is justified ground for divorce"[২১]

হাজব্যান্ডগুলো ছাড়তে ছবির যে একটুও কষ্ট হয়নি তা নয়। আসলে—

> ''ছবি।। যে দাঁতটা নড়ছে সেটাকে উপড়ে ফেলতে একটু কষ্ট হয় বইকি, তবে ফেলে দেবার পর বড় শান্তি।''[২২]

এই নাটকে নাট্যকার বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে শহুরে কালচারকে তুলে ধরেছেন। বিশ্বায়নের যুগে কেউ আর চিরন্তন প্রেমের সম্পর্কে বন্দি থাকতে চায় না। বিবাহটা যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে কেরিয়ার গড়ার একটা উপায়। নরনারীর ভালোবাসাও পণ্যে পরিণত হয়ে গেছে। 'ইউস অ্যান্ড থ্রো পেন'-এর মতো ভালোবাসার স্থায়িত্ব। আসলে বাজার অর্থনীতিরই কুপ্রভাব এটা। এই বাজার অর্থনীতি মানুষের মানবিক মূল্যবোধ, প্রেমের সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করেছে। বাজার অর্থনীতি, বিশ্বায়ন সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ, ও নরনারীর ভালোবাসাকে পণ্যে পরিণত করেছে। নাট্যকার বাইরে হাসির মোড়কে নাটকটা উপস্থাপন করলেও এর ভিতরে রয়েছে তীব্র বেদনার হাহাকার।

ইন্টারভিউ: 'ইন্টারভিউ' অণুনাটকটি ২০০৯ সালে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে 'গণনাট্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই নাটকে রয়েছে তিনটি চরিত্র—মেয়েটি, অফিসার এবং বেয়ারা। নাটকটিতে একটি মার্কেটিং ফার্মে একটি মেয়ে কাজের জন্য দরখাস্ত করেছিল। কিন্তু মেয়েটি তার বাবার অসুস্থতার কারণে ইন্টারভিউ দিতে সঠিক সময়ে উপস্থিত হতে পারেনি। অথচ মেয়েটির এই চাকরিটা খুব দরকার ছিল। তাই একান্ত নিরুপায় হয়ে ইন্টারভিউ শেষ হওয়ার অনেক পরে সে এক্সিকিউটিভ অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে যায়। মেয়েটি নিজের দুরবস্থার কথা জানিয়ে অফিসারকে বারবার ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করতে থাকে। কিন্তু অফিসার পরিষ্কার জানিয়ে দেন, সময়মতো যারা ইন্টারভিউ দিতে আসতে পরেনি তাদের আবেদন নাকচ হবে। মেয়েটি জানায়,এব্যাপারে সেও সম্পূর্ণ অসহায়। চাকরিটা তার খুব দরকার। অফিসার আশ্চর্য হন মেয়েটির কথায়, সে ভেবেছে ইন্টারভিউ দিলেই তার চাকরি হবে। অফিসার বলেন—

> ''অফিসার ।। আজকের hard reality সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণাই নেই দেখছি। Are you a child?''[২৩]

মেয়েটি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দেয়—

''মেয়েটি ।। ইন্টারভিউ আমি খারাপ দিতাম না স্যার। সুযোগ পেলে আমি তার প্রমাণ দিতে পারি। আমার এই Confidence-এর মধ্যে কোন ছেলেমানুষি নেই।''[২৪]

অফিসার কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। অবশেষে মেয়েটি অফিসারের মানবিক আবেগের কাছে কড়া নাড়ে। মেয়েটি বলে, ''বাবা বললেন, একবার যা মানুষের তো দয়া-মায়া থাকে, তোকে একটা সুযোগ দিতেও পারেন। কিন্তু তা হল না।'' অফিসার পাল্টা জবাব দেন, ''আমাদের firm-এ যখন লোক নেওয়া হয় তখন বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমার দয়ামায়ার বোধ কাজ করে না। তখন আমার sympathetic heart-এর কোন function থাকে না। আমাদের House-এর interest-এ যোগ্যতম প্রার্থী বেছে নেওয়াই শেষ কথা।''[২৫]

একথা শুনে মেয়েটি নমস্কার জানিয়ে চলে গিয়েও আবার অফিসারকে অনুরোধ করে তার বিষয়টা বিবেচনার জন্য। শেষে অফিসার বিগলিত হয়ে মেয়েটিকে বলেন ফর্মের ডুপ্লিকেট কপি রেখে যাওয়ার জন্য। মেয়েটি এতক্ষণে সুস্থবোধ করে। ধন্যবাদ জানানোর ভাষা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু অফিসারটি বলেন—

''অফিসার ।। But young lady, interview পাওয়া আর চাকরি পাওয়া তো একই ব্যাপার নয়। Sales-এর চাকরিতে আপনার অ্যাকাডেমিক tempartment, attitude, personality, aggresiveness সবই তো আমাদের দেখতে হবে। আমরা খুঁজব একজন fighter-কে। এই sprit-টা আপনার আছে কি?''[২৬]

মেয়েটি চলে যায়। অফিসার কাজে মন দেন। কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটি ঢোকে। অফিসার টের পান না। কী মনে করে অফিসার মেয়েটির আবেদনপত্র তুলে নেন। মুহূর্তকাল চোখ বোলান। মেয়েটি নিজেকে একটু আড়াল করে দেখে। অফিসার এবার কাগজপত্র দলা পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার বক্সে ফেলে দেন। আবার ফাইলে মন দেন। মেয়েটি ধীরে এসে 'স্যার' বলে ডাকে। অফিসার যেন চমকে ওঠেন, অত্যন্ত বিরক্ত হন। মেয়েটি জানায়, তার অ্যাপলিকেশনে মোবাইল নম্বরটা দিতে আবার এসেছে সে। অফিসার নাম্বারটা দিয়েই চলে যেতে বলেন। মেয়েটি বলে—

''মেয়েটি ।। আপনি জানতে চেয়েছিলেন আমি চাকরির কাজে fighter হতে পারি কিনা।''

সে ওয়েস্ট পেপার বক্স থেকে তার দলা পাকানো আবেদনপত্রটা তুলে, অফিসারের গায়ে ছুঁড়ে মেরে বলে— ''মেয়েটি ।। I can be fighter, এবার আপনি কী পারেন করুন।''[২৭]

দয়ামায়াহীন অমানবিক, হৃদয়হীন সমাজে এক অসহায় বেকার মেয়ের ফাইটার হয়ে ওঠা দেখতে পাই এই ছোট্ট নাটকটিতে।

মুখ : 'মুখ' অণুনাটকটি 'নাট্যসৃজনী' পত্রিকায় শারদীয় ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকটি শুরু হয় একটি থানার মধ্যে। দারোগাবাবুর অফিসঘর, কিন্তু তিনি অনুপস্থিত। অফিসে একটি চেয়ারে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একজন আধুনিক চাকচিক্য সম্পন্ন মহিলা বসে আছে। তার নাম তিথি। তার মোবাইলটা বেজে ওঠে। তিথি বাজারে কেনাকাটা করতে গিয়ে তার পার্সটা হারিয়ে ফেলেছে। পার্সে

হাজার তিনেক টাকা, ক্রেডিট কার্ড, অফিসের আইডেন্টিটি কার্ড আর কিছু জরুরি কাগজপত্র ছিল। তাই সে থানায় জানাতে এসেছে; কিন্তু ওসি ডিউটিতে গেছেন। একটু পরে আসবেন। থানায় মহিলাটির ব্যাগটার কাছে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। লোকটির মুখটি দেখতে ক্রিমিনাল টাইপের। দেখলেই মনে হবে লোকটি ক্রিমিনাল। কিন্তু ঠিক এই লোকটিকেই তিথি বাজারের দোকানটিতে দেখেছিল যেখানে তার পার্সটি হারিয়ে গিয়েছিল। তাকে এখানে দেখে সে চমকে ওঠে। তিথির দৃঢ় বিশ্বাস এই লোকটিই তার পার্সটি চুরি করেছেন।

লোকটি টেবিল রাখা খাতায় নামটা এনট্রি করে তিথির পাশের চেয়ারটিতে বসতে যায়। তিথি লোকটিকে চোর সন্দেহ করে ব্যাগটা বাঁ পাশ থেকে সরিয়ে নিজের কোলে রাখে। লোকটি লক্ষ করেন। লোকটির জীবনে এটা নতুন ঘটনা নয়। বহুকাল ধরে বারবার তার সঙ্গে এটা ঘটে চলেছে। তিনি দেখেছেন যে কোনও অচেনা লোক তার মুখের দিকে কেমন একটা সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়, ভাবে লোকটা বুঝি সুবিধের নয়। লোকটি বুঝতে পারেন, এই মহিলাটিও তাকে সন্দেহের চোখেই দেখেছে। তাই নিজের ব্যাগটি সরিয়ে রাখল। অথচ লোকটির মেয়ে ও স্ত্রী তার মুখে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পায়নি কখনো। তার আর কয়েকজন মানুষ ছাড়া সকলেই এই মহিলাটির মতো, তার মুখের দিকে তাকালেই সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে।

আসলে এই লোকটিই তিথির পার্সটি পেয়েছিলেন। তাই তিনি নিজে গরজ করে থানায় দিতে এসেছেন। এটা জানানোর পর তিথি আশ্চর্য হয়ে যায় লোকটির মহানুভবতায়।

আসলে মানুষের বাইরেরটা যেরকম তার ভিতরেরটা সেরকম নয়। মুখটা দেখে কখনো বোঝা যায় না মানুষটিও তাই। মানুষের চোখ সবটাই দেখতে পায় না— হৃদয় মনটাই কেবল পুরোটা দেখতে পায়। এভাবেই নাটকটি crisis থেকে শুরু করে Tension ও conflict-এর মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পরিণামের দিকে যায়।

কাঁথা : 'কাঁথা' অণুনাটকটি 'গণনাট্য' পত্রিকায় ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকটির তিনটি চরিত্র বুড়িমা, ছেলেটি এবং বিলু। পার্কের বেঞ্চে একধারে গরিব ঘরের এক বুড়িমা চোখ বুজে দলে দলে ঘুমপাড়ানি গান গাইছে। নাট্যকার তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে,—

> ''ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ... তার গায়ে জড়ানো একটি পাতলা কাঁথা। কাঁথাটি বিচিত্র। নানা রঙের ছেঁড়া-খোড়া কাপড়-জামার টুকরো সেলাই করে কাঁথাটি বানানো হয়েছে। ব্যাগ হাতে ২৩/২৪ বছরের একটি ছেলে এসে বেঞ্চের অন্যধারে বসে। বুড়িমার গান চলতেই থাকে। ছেলেটি বসেই আছে। বুড়িমা মাঝে মধ্যে একটু কেঁপে উঠছে। ছেলেটি লক্ষ করে ডাকে—''[২৮]

বুড়িমা তার নাতিকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। যদিও তার নাতি সঙ্গে নেই। দু'বছরের দুধের বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে তার ছেলে আর বউ দেশের বাইরে কোথায় চলে গেছে। কাজ-কর্ম নেই, খাওয়ার কষ্টে ছেলেটা কোনও দিশা না পেয়ে কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। বলেছিল, আয় উপায়ের মতো একটা

কিছু হলেই তাকে নিয়ে যাবে। ভাঙা বস্তি বাড়িতে বুড়িমা আর তার স্বামী পুরো একবছর পথ চেয়ে বসেছিল। রোগের কষ্টে, মনের কষ্টে স্বামীও মারা গেল। ষোলো বছর সে একাকী পড়ে আছে।

ছেলেটি বুড়িমার সন্তানের সঙ্গে নিজের অনেকটা মিল খুঁজে পায়। ছেলেটিরও চাকরি-বাকরি কিছু জুটছিল না। সমর্থ ছেলে যেন গরিবের সংসারে বোঝা হয়েছিল— এটা তাকে সারাক্ষণ কষ্ট দিত। সব বুঝেও বাড়ির মানুষ তাকে উত্যক্ত করত। ছেলেটি সহ্য করতে না পেরে তাই বাড়ির বাইরে চলে এসেছে। সে আজ রাতেই দূরে কোথাও যেতে চায়, যেখানে গিয়ে রোজগার এবং নিজের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে।

ছেলেটির বাড়ি থেকে তার মা বারবার ফোন করে তাকে ঘরে ফিরে আসতে বলে। তার বন্ধু বিলু তাকে কিছু টাকা ধার দিলেও বাড়িতে ফিরে যাওয়ার বিষয়টা সে ভেবে দেখতে বলে। এখানে বুড়িমা ও ছেলেটির গল্প যেন একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। আশ্চর্য দক্ষতায় নাট্যকার যেন দুটো ঘটনাকে যুক্ত করেছেন এই নাটকে।

ছেলেটি বেঞ্চিতে বসে দেখে বুড়িমা ঠাণ্ডায় কাঁপছে। বুড়িমার কাঁথাটি কত রঙের কত কত কাপড়ের টুকরো জুড়ে সুন্দর করে বানানো। বুড়িমা তার ঘরে পড়ে থাকা ছেঁড়া-খোড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে এই কাঁথাটি বানিয়েছে। বুড়িমা বলে—

> ''বুড়িমা ।। এই যে সাদা সাদা টুকরো, এগুলো আমার কত্তার পরনের ছেঁড়া ধুতি কেটে নিয়েছি, রঙিন কাপড়ের টুকরোগুলি বউমার, এগুলো আমার নাতির হজের আর কাঁথার ফালি। এই কাঁথাটা গায়ে দিলে মনে হয়, আমার সংসারে সবাই আছে, আমার গা জড়িয়ে আছে। এই আমার শান্তি বাবা। কে কোথায় ছেড়ে চলে গেল— আমি তো ছাড়তে পারি না। সব যায় বাবা, মায়া যায় না।''[২৯]

ছেলেটি বুড়িমার কথা শুনে আবেগে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এমন সময় তার মার ফোন আসে। তার মা ছেলেটিকে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরতে বলে। তার বাড়ির প্রতি টান উথলে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মনস্থির করে ছেলেটি। বুড়িমা স্নেহে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে। বুড়িমা ছেলেটির কাছে তার ফেলে দেওয়া শার্টের একফালি কাপড় চায়। তার কাঁথার গায়ে সেলাই করে গেঁথে দেওয়ার জন্য। ছেলেটি বলে, 'সব হবে'। মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়।

ছোট্ট এই নাটকটির মাধ্যমে নাট্যকার যেন গভীর দর্শনের কথা বলেছেন। 'সব যায় মায়া যায় না।' অথচ যুগ যুগ ধরে প্রাচ্য মুনি ঋষিরা এই মায়া থেকে মুক্তির কথা প্রচার করেছেন। কিন্তু রক্তের মানুষদের, আপন মানুষদের সহজে ভোলা যায় না। মানুষ মানবিক প্রাণী। তাই তার মধ্যে রয়েছে দয়া-মমতা। আপন মানুষদের থেকে দূরে থেকে নয়, তাদের সুখ-দুঃখ ভালোবাসার সঙ্গী হয়ে নতুন করে বাঁচার সংগ্রাম শেখায় এই নাটক।

ষোলোপাতা : ২০০৯ সালে রচিত 'ষোলোপাতা' অণুনাটকটি। নাটকে দু'জন চরিত্র জলি ও বিটু। কুড়ি-বাইশ বছরের একটি ছেলে জলি দু'বছর ঘাড় গুঁজে একটি নাটক লিখছিল। সেটা এইমাত্র

কমপ্লিট হলো। গড আর ডেভিল, এই দুইয়ের ফিউশনে যে টেরিবল এনার্জি তারই বিস্ফোরণ এই নাটক। নাটকের সমস্ত কনভেনশন গুঁড়িয়ে দিয়ে লেখা হয়েছে এই নাটক। লেখার বিষয় লাইফ, মানে জীবন। জীবনের সমস্ত কিছু এই নাটকে রয়েছে। জলির মতে, দুটো চোখ দিয়ে বিশাল আকাশটা যদি দেখা যায়— বিপুল জীবনটাকেও দেখা যেতে পারে। শুধু মানুষের জীবনটাই নয়, তার সঙ্গে এই প্রকৃতি, এমনকি মহাবিশ্বের কসমিক মিস্ট্রি, জটিল সব দার্শনিক জিজ্ঞাসা, বিজ্ঞানের ব্যধি সব রয়েছে এতে।

বিটু জলিদের ফ্রেন্ডস সার্কেলের মধ্যে সবচেয়ে সমঝদার ক্রিটিক। তাই লেখাটা শেষ করেই জলি বিটুকে ডেকেছে। বিটু নাটকের স্ক্রিপটা দেখে অবাক হয়ে যায়। মাত্র ষোলো পাতার নাটক। সে বলে 'কী বিশাল তার সাবজেক্ট— তার ট্রিটমেন্ট ষোলো পাতায় কমপ্লিট?' জলি বলে,

> ''জলি ।। হার্টের সাইজ কতটুকু? তার মধ্যে একটা মানুষের একশ বছরের আয়ু ধরা থাকে না?''[৩০]

জলি তার ষোলো পাতার নাটকটি কানাডার একটা বুক পাবলিশিং, কনসার্ন এ প্রকাশ করার জন্য পাঠাতে চায়। কিন্তু একটা সমস্যা রয়েছে। পনেরো পাতার নির্দিষ্ট সংখ্যার নাটক হলেই একমাত্র কানাডার পাবলিশার্সটি ছাপাবে। কিন্তু জলির নাটকটি ষোলোপাতার হয়েছে। একপাতা কমাতে হবে। জলি অনেক ভেবে দেখেছে কিন্তু কিছুতেই একপাতা কমাতে পারছে না। কেননা জলি মনে করে—

> ''জলি ।। মানুষের শরীরটা জন্মানো থেকে বাড়তে বাড়তে এক জায়গায় এসে থেমে যায়। তারপর জোর করে বাড়ানোও যায় না কমানোও যায় না। শিল্প এইরকম ন্যাচারাল গ্রোথের প্রোডাক্ট।''[৩১]

বিটু নাটকটা পড়তে গিয়ে আশ্চর্যের আশ্চর্য হয়ে যায়। এইটুকু নাটকে দু'শ একটা কারেক্টার রয়েছে। ইন্দ্র, মহম্মদ, যীশু, কিং আর্থার, হর্ষবর্ধন, নেপোলিয়ন, সোক্রাতেস, আইনস্টাইন, পেলে, ডেরিদা, ফুকো, ওবামা, জীবনানন্দ— সেকাল একালের নানা চরিত্র এ নাটকে রয়েছে। সবাই নিজের মতো কথা বলে। টাইম ও স্পেসের প্রচলিত সমস্ত কনভেনশন জলি গুঁড়িয়ে দিয়েছে এই নাটকে।

তার নাটকের প্রোটাগান্ডিস্ট একটা প্রশ্ন তুলছে—

> ''জলি।। অধিকাংশ ভারতীয় দেবতাদের দাড়ি গোঁফ দেখা যায় না কেন? তারা কি জন্ম-মাকুন্দ? না, ঘুম থেকে উঠেই শেভ করে নেয়? সে ক্ষেত্রে নিজেই নিজের ক্ষৌরকর্ম করে, না পেশাগত হেয়ার-কাটার সে কাজটা করে দেয়?''[৩২]

বিটুর এই অংশটা তেমন সিরিয়াস মনে হয় না, তাই বাদ দিতে বলে। কিন্তু জলির মনে হয়—

> ''জলি ।। স্বর্গের হেয়ার-কাটার বা ধাঙড়, মুচি, মুটে, মজুর—এরা উপেক্ষিত, নিম্নবর্গের প্রাণীদের কথা কোনও শাস্ত্রে বা ইতিহাসে নেই। আছে কেবল স্বর্গের সেন্টারে যেসব দেবতা জাঁকিয়ে বসে আছে তাদের মহিমার কথা। তার মানে স্বর্গের একটি পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাসই কেবল আমরা পাই।''[৩৩]

জলির নাটকের গবেষক স্বর্গের হেয়ার-কাটার সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে দেব সমাজের নিম্নবর্গের ইতিহাস

রচনার কথা ভাবছে। বিটু ধরে ফেলে 'সাব-অলটার্ন হিসট্রি আর হেভেনলি ক্রিয়েচার্স' লিখতে চলেছে জলি।

জলির নাটকের তিন নম্বর পাতায় কার্ল মার্ক্স জর্জ বুশকে নিল-ডাউন করে রেখে সোস্যাল চেঞ্জের জন্য প্রোলেতারিয়েতের স্ট্রাগলের ব্যাপারটা বোঝাচ্ছেন। ছয়-এর পাতায় সানি গাভাস্কার পিটার ব্রুককে টাইমিং বোঝাচ্ছেন। বারোপাতায় তখনকার নন্দীগ্রাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটা মুভিং স্পিচ আছে। তেরো পাতায় অমর্ত্য সেন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে সোক্রোতেসকে কিছু বলছেন। সেখানে গান্ধী এবং মার্টিন লুথার কিং এসে হাজির।

জলি নাটকের কিছু অংশ বাদ দেওয়ার কথা ভাবলেও বিটু তা কিছুতেই হতে দেবে না। রাইটারের মাথাটা মার্ডারের গায়ে নুয়ে পড়তে দেবে না সে। তাই এই ষোলো পাতার নাটকটাই পাঠিয়ে দিতে বলে সে। একজন জিনিয়াস এক পাতা নিশ্চয়ই গ্রেস পাবে। আর না হলে বিটু জলিকে নিজেই প্রডিউস করতে বলে নাটকটা। চারদিক কেঁপে উঠবে জলির এই নাটকটা মঞ্চস্থ হওয়ার পর।

পোকামাকড়ের কুটুম : 'পোকামাকড়ের কুটুম' নাটকটি ২০০৯ সালে লেখা। নাটকটিতে কাতু নামে এক যুবক কুড়ানির কাজ করে। বস্তায় করে ভাঙা প্লাস্টিক, লোহা কুড়িয়ে তার দিন যায়। হাসি নামে আরেকজন কুড়ানির সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। হাসির স্বামী মদ খেয়ে রোজ তাকে পেটাত। তাকে জোর করে বিয়ে করেছিল। এদিকে দেশে তার বউ বাচ্চা ছিল, অথচ হাসির কাছে তার বিয়ের খবরটা লুকিয়েছিল। তাই এমন সংসারে সে লাথি মেরে পালিয়ে এসেছে।

কাতু কখনো কুড়ানির কাজ করে, কখনো জাহাজে রান্নার থালা বাসন মাজে। সে বলে—

> ''কাতু ।। আমরা বোধকরি ঠিক মানুষ না ... আমরা এখানকার পোকামাকড়, ইঁদুর-ছুঁচো আর কুত্তাগুলোর কুটুম।''[৩৪]

সে কুড়ানির কাজ করে শুনে একবার এক বাবুর খুব কষ্ট হয়েছিল। বলেছিল—

> ''কাতু ।। তোদের তো কেউ মানুষ ভাবে না। তোদের জন্য রেশন কার্ড হয় না, ভোট দিতে ডাকে না, থাকার জায়গা পর্যন্ত নেই। তোরাও জঞ্জাল। এই যখন অবস্থা তখন তোরা জোট বেঁধে তোদের দাবি দাওয়া নিয়ে মিছিল কর। যারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য বদলাতে চায় না, কেউ এগিয়ে এসে তাদেরি ভাগ্য বদলে দেবে না।''[৩৫]

তারপর থেকে কাতু বাবুর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে জোট বাঁধার চেষ্টা করে। হাসিকেও তার দলে আসতে বলে। হাসি রাজি হয়। কিন্তু বাঁধ সাধে হাসির স্বামী পানু। পানু কাতুকে হুমকি দেয়, হাসিকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে। কিন্তু কাতু কৌশল করে পানুকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়।

কাতু মনে মনে সেদিনটার স্বপ্ন দেখে— যেদিন তারা শয়ে শয়ে মিছিল করে চলেছে— তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের মিছিল, কাতু তার বস্তার ভিতর থেকে খেলনা ড্রাম আর দুটো কাঠি বের করে গলায় ড্রামের ফিতেটা ঝোলায়। কাতু ড্রাম বাজাতে বাজাতে বৃত্তাকারে মঞ্চ পরিক্রমা করে। পিছনে মুষ্টিবদ্ধ হাত ঝাকিয়ে হাসি স্লোগান তোলে—

''ক্রমশ একটা, দুটো করে অনেকগুলি ড্রাম নেপথ্য থেকে বাজতে থাকে। ড্রামের শব্দ ক্রমশ তুঙ্গে ওঠে। মঞ্চ ধীরে অন্ধকার হয়।''[৩৬]

এইভাবে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অণুনাটক শুধু অল্প সময়ের নাটক বলেই লঘু বিষয় নিয়ে দর্শককে হাসাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না— দর্শকের চেতনা, মননকেও জাগিয়ে তোলে। লোহা ভাঙা, প্লাস্টিক কুড়ানো, পোকামাকড়ের কুটুম অন্ত্যজ সর্বহারা মানুষদের জাগিয়ে দিয়ে এই অণুনাটক যেন শোষণ মুক্তির পথে এগিয়ে চলে। ফলে একটা 'Meaningful Journey' করে।

তথ্যসূত্র:

১. কবিতা সংগ্রহ। মোহিত চট্টোপাধ্যায়। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩। পৃ. ১৬২

২. অণুনাটক সংগ্রহ। মোহিত চট্টোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৬। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন। কলকাতা। পৃ. ৯।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৫. মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা-২০১৩। প্রমা। অতিথি সম্পাদক শুভঙ্কর রায়। কলকাতা। পৃ. ১৪৬।

৬. অণুনাটক সংগ্রহ। মোহিত চট্টোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৬। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন। কলকাতা। পৃ. ১১।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।